# পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষায় নতুন করে ভাবতেই হবে

মোহিত রায়

**প্রকাশক :** ভারতীয় সংস্কৃতি ট্রাস্ট

**প্রকাশকাল :** রাস পূর্ণিমা, ২০১৭

**মুদ্রক :** নিউ ভারতী প্রেস
বিধান সরণী, কল - ৬

সহযোগ রাশি : দশ টাকা মাত্র

# পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষায় নতুন করে ভাবতেই হবে

**পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব কি বিপন্ন**

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব কি বিপন্ন? এই প্রশ্নটা বেশীরভাগ পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে হয়তো অদ্ভুত মনে হবে। বলবেন কেন আমরা তো পশ্চিমবঙ্গে বেঁচেবর্তে আছি। সব রাজ্যের বিভিন্ন আর্থিক সমস্যা থাকে, পশ্চিমবঙ্গেরও আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বই থাকবে কিনা এমন আজব কথাতো শুনি নি। পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষা করা মানেই বা কি? পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটা কি আর থাকবে না? পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতের বাইরে চলে যাবে? এসব যদি না হয় তবে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষা করার আলাদা করে কি দরকার আছে? তাহলে পশ্চিমবঙ্গ তো আছেই।

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের সমস্যা নিয়ে বেশীরভাগ মানুষের এই ভাবনার কারণ এই যে প্রশ্নটা আমরা এখনো কোথাও তুলেই ধরি না। শিক্ষিত বাঙালি মহলের আলোচনায়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কে, দৈনিক সংবাদপত্রে, টেলিভিশনের চ্যানেলে—কোথাও এ নিয়ে আলোচনা হয় নি। সুতরাং বেশীরভাগ মানুষের কাছে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের সমস্যা বলে কিছু নেই। অসুস্থ মানুষ অনেক সময় নিজেই জানে না যে সে অসুস্থ। সে বলে আমিতো বেশ ভালই আছি। প্রশ্ন করলে জানা যাবে যে তিনি তাঁর শারীরিক বিভিন্ন বিষয়ের যেমন রক্তচাপ, শর্করা ইত্যাদির পরিমাপ এখনো করান নি। একটু বেশী প্রশ্ন করলে জানা যাবে যে তার কিছু কিছু উপসর্গ আছে কিন্তু সেসবের তোয়াক্কা তিনি করেন না। তিনি তো মনে করেন বেশ ভালই আছেন। যেমন এখনো পশ্চিমবঙ্গবাসী হিন্দু সমাজের একটি বড় অংশ মনে করে তাঁরা ভালই আছেন।



কিন্তু তাঁকে যদি প্রশ্ন করা হয়

— কেন পশ্চিমবঙ্গে তসলিমা নাসরিন থাকতে পারেন না?

— কেন পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার ইমামদের ভাতা দেওয়া হলেও দরিদ্র পুরোহিতরা ভাতা পান না?

— কেন পশ্চিমবঙ্গে দুর্গা পূজার নির্ঘণ্ট মুসলমান উৎসবের জন্য পাল্টানো হয়?

— কেন পশ্চিমবঙ্গে দেগঙ্গা, ক্যানিং, ধুলাগড়, কালিয়াচকে জ্বালিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় হিন্দু ঘরবাড়ি, মন্দির?

— কেন পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু নারীরা মুসলমান দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা ধর্ষিতা, অত্যাচারিতা হয়?

— কেন পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা ধ্বাংসাত্মক কাজ করলেও পুলিশ তৎপর হয় না?

— কেন পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যার শতাংশ কমতেই থাকবে এবং মুসলমানদের বাড়তেই থাকবে?

এরকম আরো অনেক প্রশ্ন রয়েছে। আর যেসব ঘটনাগুলির কথা বলা হলো তাতে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিন্দু সমাজের সব মানুষেরাই আক্রান্ত। দেগঙ্গা, কালিয়াচকে বা ধুলাগড়িতে যখন হিন্দু বাড়িঘর, দোকান জ্বালানো হচ্ছিল তখন তারা কে তৃণমূল, কে সিপিএম বা কে বিজেপি বলে কোন বাছবিচার করেনি। সব হিন্দুই আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু তৃণমল, সিপিআইএম বা কংগ্রেসকে কি কোনদিন এসব নিয়ে কোন কথা বলতে শুনেছেন? নদীয়ায় জুরানপুরে পাঁচজন তফশিলি সমাজের মানুষ মুসলমান দুষ্কৃতীদের আক্রমণে মারা যান তখন কোন তফশিলী সংগঠন বা রাজনৈতিক দলকে এর প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না। উপরের এইসব ঘটনা যে প্রশ্নটি সামনে নিয়ে আসে—পশ্চিমবঙ্গ কি সত্তর বছর আগে এইজন্য তৈরি হয়েছিল? লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবার যাঁরা ইসলামি পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা কি এই পশ্চিমবঙ্গের কথা ভেবেছিলেন যেখানে আবার তাঁদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আবার তাঁদের ঘরের মেয়েকে অত্যাচার করতে পারে মুসলমান দুষ্কৃতিকারীরা। তাহলে কি পশ্চিমবঙ্গ আর হিন্দু সমাজের জন্য নিরাপদ জায়গা নয়? তাহলে যে জন্য পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়েছিল সেই পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব কি আর নেই?

**পশ্চিমবঙ্গ কেন তৈরি হয়েছিল বা পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব বলতে কি বোঝায়**

পশ্চিমবঙ্গ কেন ও কিভাবে তৈরি হয়েছিল এই বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের স্কুল কলেজে ঠিকমতন জানানো হয় না। নতুন প্রজন্মের মানুষেরা জানেন যে স্বাধীনতার সময় ইংরেজরা চক্রান্ত করে ভারতবর্ষকে ধর্মের নামে ভাগ করে দিয়ে যায়। এভাবেই বাংলা ভাগ হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হয়। যেজন্য এখানে মাঝেমাঝেই দুই বাংলা যে একই দেশ, তাদের এক ভাষা, এক সংস্কৃতি এরকম বেশ আবেগপূর্ণ কথা বলা হয়। সেজন্য আমাদের জানা দরকার যে মুসলমান জনসাধারণের প্রতিনিধি দল মুসলিম লীগের ভারতবর্ষের মুসলমান প্রধান অংশগুলিকে নিয়ে আলাদা পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবীতে ভারত ভাগ হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে যখন ব্রিটিশ সরকারের আর ভারতে রাজত্ব চালানোর শক্তি ছিল না তখন তারা ভারতবর্ষকে এভাবে ভাগ করে স্বাধীনতা প্রদান করেন। এইভাবে পাকিস্তান তৈরি করতে গিয়ে ভারতবর্ষের পশ্চিমের মুসলমানপ্রধান সিন্ধুপ্রদেশ, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাঞ্জাব রাজ্যকে দুভাগ করে পশ্চিমের মুসলমানপ্রধান অংশ যায় পাকিস্তানে এবং হিন্দু-শিখ প্রধান অংশ থাকে ভারতে।

১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ী যুক্ত বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) মুসলমানরা ছিল ৫৬% আর হিন্দুরা ৪৪%। দুটি পক্ষের মধ্যে জনসংখ্যার ফারাক খুব বেশী ছিল না। কিন্তু মুসলিম লীগ ও কমুনিস্ট পার্টি চেয়েছিল পুরো বাংলাই যাক পাকিস্তানে। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান শাসনের অভিজ্ঞতা ও পরে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত মুসলিম লীগ শাসনের অভিজ্ঞতায় বাঙালী হিন্দু জেনেছিল মুসলিম শাসিত কোন স্থানে তাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। ফলে বাংলা ভাগ হবে কিনা না কোন দেশে যুক্ত হবে তা নিয়ে ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন বঙ্গীয় আইনসভায় ভোটাভুটি হয়। সেদিন বঙ্গীয় আইনসভা ভেঙে তৈরী হল পূর্ববঙ্গ আইনসভা ও পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা। বাংলার হিন্দু প্রধান অংশগুলির প্রতিনিধি নিয়ে তৈরি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা। এই ভোটে তফসিলি প্রতিনিধিরা সহ সব হিন্দু প্রতিনিধিই বাংলা ভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষে ভোট দেন। পশ্চিমবঙ্গ সেদিনই তৈরি হয়ে গেল।



অর্থাৎ এককথায় পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের দুটি ভিত্তি —

১) **যথেষ্ট সংখ্যায়** হিন্দুদের সংখ্যাগুরুত্ব (কেবল ৫০ শতাংশ নয়), যার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা চিহ্নিত হলো।

২) পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় তথা হিন্দু সংস্কৃতির অবাধ চর্চা, ভারতীয় ও হিন্দু বিরোধী সংস্কৃতির অবসান, হিন্দু নারীদের সম্পূর্ণ সুরক্ষা ও বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক সমাজ।

আমরা পরে দেখবো কিভাবে এই দুটি শর্তই ভীষণভাবে লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে। সেজন্যই আমরা বলছি পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব বিপন্ন।

**পাঞ্জাবও একই সময়ে ভাগ হয়েছিল, সেখানে কি এই সমস্যা আছে?**

না, পাঞ্জাবের অস্তিত্বের কোন সমস্যা নেই। তার কারণ দেশভাগের সময় পাঞ্জাব জুড়ে হিন্দু-শিখদের সঙ্গে মুসলমানদের ব্যাপক দাঙ্গার ফলে সেখানে জনবিনিময় হয়। অর্থাৎ মুসলমানরা পাকিস্তানের পাঞ্জাবে চলে যান, হিন্দু-শিখরা ভারতে পাঞ্জাবে চলে আসেন। ফলে ভারতের পাঞ্জাবে যেমন মুসলমান প্রায় নেই বললেই চলে তেমনি পাকিস্তানের পাঞ্জাবে হিন্দু-শিখ নেই। সুতরাং গত ৭০ বছরে পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখেরা কোন সমস্যায় পড়েন নি, পাঞ্জাবের অস্তিত্বের কোন সমস্যা নেই। মনে রাখতে হবে হিন্দু-মুসলমান জনবিনিময়ের অন্যতম প্রথম প্রবক্তা ছিলেন ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকার।

**তাহলে বাংলায় কেন জনবিনিময় হলো না**

এটাতো বোঝা খুবই সহজ যে দুই বাংলার মধ্যে যদি জনবিনিময় হতো তাহলে পাঞ্জাবের মতন পশ্চিমবঙ্গেও হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা থাকত না। দেশভাগের ঠিক আগে ১৯৪৬-এর ১৬ই আগষ্টকে মুসলিম লিগের নেতা জিন্না ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে বা প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের দিন বলে ঘোষণা করেন। সেই দিন কলকাতা ময়দানে বিশাল জনসভা হয় যাতে ভিড়ের জন্য আমন্ত্রিত হয়েও উপস্থিত থাকতে পারেন নি কমুনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু। এই সভা থেকেই শুরু হয় কলকাতা জুড়ে হিন্দুদের উপর নারকীয় আক্রমণ। এটি করা হয় বাংলার

প্রধানমন্ত্রী (এখনকার মুখ্যমন্ত্রী) মুসলিম লীগ নেতা শহীদ সুরাবর্দীর নেতৃত্বে। দুদিন পর এই আক্রমণের রূপ পাল্টে যায়, হিন্দু-শিখদের প্রতিরোধে পরের তিন দিন মুসলমানরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। কয়েক হাজার মানুষ এই দাঙ্গায় নিহত হন যাকে বলা হয় গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। এর বদলা নিতে দু মাস পরে ১৯৪৬-এ পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে বেশ কয়েকদিন ধরে চলে হিন্দু গণহত্যা, নারীধর্ষণ ও ধর্মান্তর। এসবের পরেই বাংলা ভাগ করার ব্যাপারটি নিশ্চিত হয়ে যায়। স্বাধীনতার ঠিক আগে মে মাসেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি চিঠিতে ব্রিটিশ সরকারকে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে জনবিনিময়ের প্রস্তাব দেন কিন্তু তা গ্রাহ্য হয়নি। ফলে সেসময় জনবিনিময় হলো না।

ঠিক স্বাধীনতার সময়ে বাংলা শান্ত ছিল ফলে জনবিনিময়ের কথাটা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু এক বছর না কাটতেই পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয়ে গেল ক্রমাগত হিন্দু নির্যাতন, হিন্দু উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করলেন। তারপর ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে হল হিন্দু গণহত্যা। লক্ষ লক্ষ হিন্দু সব হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিলেন। তখন আবার জনবিনিময়ের প্রশ্নটি ফিরে এল। কিন্তু পাঞ্জাবে তা হলেও পশ্চিমবঙ্গে এটি হতে দিলেন না তৎকালীন কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি করে পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংস করার বিষবৃক্ষ রোপণ করে দিলেন।

**নেহেরু-লিয়াকত চুক্তিটি কি, কেন এটি নেহেরুর বাংলার প্রতি জঘন্য প্রতারণা**

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের উপর ভয়ানক আক্রমণ চালানো হয়। অনেকে মারা যান, মেয়েরা ধর্ষিতা হন, বাড়িঘর সম্পত্তি নষ্ট হয়। এক মাসের মধ্যে কয়েক লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এসে উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলি পরিদর্শন করেন, উদ্বাস্তুদের নিদারুণ অবস্থা স্বচক্ষে দেখে যান, শুনে যান কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলছে। এই সময় দিল্লিতে সংসদে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র জনবিনিময়ের দাবী তোলেন, দাবী তোলেন



অন্য প্রদেশের প্রখ্যাত নেতারা। এই দাবীর পক্ষে ছিলেন ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকার। কিন্তু নেহেরু এসবকে 'ননসেন্স' বলে অগ্রাহ্য করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করতে পাকিস্তানের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। তাঁর আমন্ত্রণে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত খান ভারতে আসেন ও নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে বলা হয় যে পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দুরা এবং ভারতে চলে আসা মুসলমানরা আবার নিজের নিজের দেশে ফিরে যাবেন এবং তাদের সুরক্ষা ও সম্পত্তির দায়িত্ব সে দেশের সরকার নেবে। এক কথায় উদ্বাস্তু হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাবেন এবং তাদের সুরক্ষা দেবে ও তাঁদের লুণ্ঠিত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে ইসলামি পাকিস্তানি সরকার! এরকম একটি ভণ্ডামি জওহরলাল নেহেরু-র পক্ষেই করা সম্ভব। এর আগেই তিনি দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কাশ্মীরে বিজয়ী ভারতীয় সৈন্যদের অভিযান থামিয়ে কাশ্মীরের একটি বড় অংশ পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়েছেন। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রিটিশ আমেরিকানদের প্রাধান্যের সংস্থা রাষ্ট্রসংঘে গিয়ে ভারতের অবস্থানকে আরো দুর্বল করেছেন। সুতরাং জওহরলাল যে ইসলামি পাকিস্তানের উপর পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুদের মানসম্মান নিরাপত্তার ভার ছেড়ে দিতে চাইবেন তা আর আশ্চর্য কি। এই চুক্তির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের দুজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই— শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা কে সি নিয়োগি নেহেরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। ভাবুন একবার পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীরা নেহেরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করছেন পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আর তাদের পাত্তা না দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করছেন জওহরলাল নেহেরু। এই অন্যায়ের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসকেও নিতে হবে।

**পশ্চিমবঙ্গ গঠনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কি ভূমিকা ছিল**

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই আজকের পশ্চিমবঙ্গ গঠন সম্ভব হয়। সেজন্য শ্যামাপ্রসাদকে পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা বলা হয়। যদিও গত সত্তর বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে স্কুল কলেজে শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে কোন কিছু পড়ানোই হয় নি, ফলে সাধারণ বাঙালির কাছে তিনি অপরিচিত রয়ে গেছেন। অনেকেই তাঁকে চেনেন কেবল 'বাংলার বাঘ' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র হিসাবে। শ্যামাপ্রসাদ অখণ্ড

ভারত চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন দেশ ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হচ্ছেই তখন তিনি বাংলার হিন্দুদের নিরাপত্তা, ধর্ম ও সংস্কৃতি বাঁচাতে হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের দাবী নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গা ও নোয়াখালির হিন্দু গণহত্যার পর তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে মুসলমান শাসনে হিন্দুরা নিরাপদ থাকবেন না। শ্যামাপ্রসাদকে সমর্থন জানিয়েছিলেন বাংলার বিখ্যাত মনীষিরা—রমেশচন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকার, মেঘনাদ সাহা অন্যান্যরা। পরে বাংলার কংগ্রেস এই দাবী মেনে নেয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাঙালি হিন্দু সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজের সঙ্গে তারা নিরাপদে সসম্মানে থাকতে পারবে না। বাংলার দুই আইনসভাতেই অমুসলিম সদস্যরা বাংলাভাগের পক্ষে ও পাকিস্তানে যোগদানের বিপক্ষে ভোট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠন সুনিশ্চিত করেন। শ্যামাপ্রসাদ চেয়েছিলেন সব হিন্দু বাঙালিই সুরক্ষিত থাকুন। সেজন্য তিনি দেশভাগের ঠিক আগে ১৯৪৭-র মে মাসে ভারতের শাসনকর্তা লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে এক চিঠি দিয়ে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে হিন্দু মুসলমান জনবিনিময়ের প্রস্তাব দেন। দুঃখের বিষয় যে তা মানা হয় নি, হলে আজকের এই পুস্তিকা প্রকাশের কোন প্রয়োজন পড়ত না। পশ্চিমবঙ্গ গঠনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ সঠিক ছিল তার প্রমাণ পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ঘটনাবলী। মুসলমানপ্রধান পূর্ব পাকিস্তানের ২৯% হিন্দু এখন বাংলাদেশে ৮% হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ তৈরি নয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গকে একটি সমৃদ্ধ রাজ্য তৈরি করবার প্রচেষ্টাও নিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ একটি সমৃদ্ধ রাজ্য হিসেবে গঠন করার অন্যতম শর্ত হলো এর হিন্দু জনপ্রাধান্য বজায় রাখা। আগেই বলা হয়েছে যে ১৯৫০ সালের পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুবিরোধী ভয়াবহ আক্রমণের পর কেন্দ্রীয় সংসদে জনবিনিময়ের দাবী ওঠে। এর বদলে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু চাপিয়ে দেন কুখ্যাত নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করতে গিয়ে যা বলেন তাতেই পশ্চিমবঙ্গের অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল—১৯৫০ সালের ১৪ই এপ্রিল সংসদে তিনি বলেন,—'ব্যাপক সংখ্যায় হিন্দুরা আসতেই থাকবেন, আর যাঁরা আসবেন তাঁরা ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না। অন্যদিকে



যে সমস্ত মুসলমান চলে গিয়েছিলেন তাঁরা ফিরে আসবেন এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস চুক্তিটির একতরফা রূপায়ণে মুসলমানেরা ভারত ছেড়ে যাবেন না। আমাদের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে যাবে এবং আমাদের দেশের মধ্যেকার সংঘাত আরো বেড়ে যাবে।' বাস্তবে ঠিক তাই হলো। লক্ষ লক্ষ হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে এলেন, একজন হিন্দু উদ্বাস্তু চুক্তি অনুযায়ী ফিরে গেলেন না। বরং নেহেরু লিয়াকত চুক্তির সুযোগে যে সমস্ত মুসলমানরা পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন তাঁদের বড়ো অংশই ফিরে এলেন। পশ্চিমবঙ্গের এত বড়ো সর্বনাশের কথা শ্যামাপ্রসাদ আগেই বলে দিয়েছিলেন।

এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী হিসাবে সারা ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও তিনি শিল্প উন্নয়নের ভিত্তিটি তৈরী করে গিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের দুটি প্রধান কেন্দ্র আসানসোলের কাছে চিত্তরঞ্জন রেলকারখানা ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা স্থাপনের শুরু হয় তাঁর হাত দিয়েই। আম্বেদকার ও মেঘনাদ সাহার পরিকল্পিত দামোদর উপত্যকা নিগম বা ডিভিসি-র গঠন করেন শ্যামাপ্রসাদ। পশ্চিমবঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষিতে সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প স্থাপন—সব কিছুতেই ডিভিসি-র অবদান রয়েছে। আমাদের, ভারতের ও বাঙালির, দুর্ভাগ্য যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বেশী দিন কাজ করবার সুযোগ পেলেন না। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী হয়ে বাংলায় ও দেশজুড়ে যে বিরাট কর্মযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন তা দুবছর পরেই স্তব্ধ হলো। প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর পাকিস্তান তোষণ নীতির বিরুদ্ধে ও বাংলার হিন্দু সমাজের স্বার্থে পদত্যাগ করলেন ১৯৫০-এর এপ্রিলে। এর পরই গড়ে তুললেন ভারতের রাজনীতিতে একটি বিকল্প রাজনৈতিক দল জনসংঘ। কিন্তু তার দুবছর পরেই ১৯৫৩-র ২৬ মে তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল শেখ আবদুল্লার কাশ্মীর সরকার এবং নেহেরুর কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্ত। বাংলার মতনই কাশ্মীরের মানুষের সর্বনাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু। শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে প্রবেশ করেছিলেন কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করতে, কিন্তু সেখানে তাঁকে গ্রেপ্তার করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রেখে, তাঁকে চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে একরকম পরোক্ষ হত্যা করা হয়। শ্যামাপ্রসাদের রহস্যজনক মৃত্যুর সদুত্তর এখনো পাওয়া যায় নি।

## শ্যামাপ্রসাদের জনসংঘ থেকে আজকের বিজেপি কিভাবে হল

স্বাধীনতার সময়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান ছিলেন মাধব সদাশিবরাও গোলওয়ালকর যাঁকে সবাই 'গুরুজী' বলে জানেন। ইনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন, পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারীও ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে তিনি মনে করলেন যে সংঘ রাজনীতিতে না জড়ালেও কিছু স্বয়ংসেবকের রাজনীতিতে আসা দরকার। এই সময়েই তিনি সামনে একজন সুযোগ্য নেতা পেলেন—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাংলার হিন্দু সমাজের রক্ষায় যিনি বিখ্যাত শিক্ষাবিদ হয়েও রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন হিন্দু মহাসভার সভাপতি হয়ে। ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের পর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে নতুন রাজনৈতিক দল গড়বার সুযোগ পেলেন গোলওয়ালকরজী। নতুন দল তৈরি করার জন্য গোলওয়ালকরজী শ্যামাপ্রসাদকে দিলেন তাঁর নিজের হাতে তৈরি, বাছাই করা কিছু স্বয়ংসেবক—যাঁদের মধ্যে ছিলেন দীনদয়াল উপাধ্যায়, সুন্দরসিং ভাণ্ডারী, জগদীশ মাথুর, অটলবিহারী বাজপেয়ী। শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে যে দলের প্রতিষ্ঠা হল তার নাম হল ভারতীয় জনসঙ্ঘ, নির্বাচনের প্রতীক 'প্রদীপ' (হিন্দীতে দীপক)। ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। জনসঙ্ঘ বাড়তে লাগল। দল আরম্ভ হয়েছিল স্বয়ংসেবকদের নিয়ে, কিন্তু কালক্রমে সঙ্ঘের বাইরের বহু মানুষ এসে পার্টিতে যোগ দিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছু জাতীয়তাবাদী মুসলমানও ছিলেন। ইতিমধ্যে বন্দী অবস্থায় অতিশয় সন্দেহজনক পরিস্থিতির মধ্যে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হল। তাতে পশ্চিমবাংলার পার্টি খুব ঘা খেল, কিন্তু বাকি ভারতে জনসঙ্ঘের অগ্রগতি অব্যাহত রইল। এরপরে ১৯৬৮ সালে অপঘাতে মৃত্যু হয় পার্টির অন্যতম প্রাণপুরুষ দীনদয়াল উপাধ্যায়ের, যার সমাধান আজ পর্যন্ত হয়নি। ১৯৭৫ সালের ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনী মামলায় হেরে গিয়ে জরুরী অবস্থা জারী করলেন, জয়প্রকাশ নারায়ণ আহ্বান জানালেন সমস্ত কংগ্রেস-বিরোধী অ-কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে এক হয়ে কংগ্রেসের মোকাবিলা করতে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনসঙ্ঘ স্বেচ্ছায় নিজেদের অস্তিত্ব বিলোপ করে জয়প্রকাশ গঠিত 'জনতা পার্টি'তে যোগ দিল। সঙ্গে যোগ দিল প্রজা সোশালিষ্ট পার্টি, কংগ্রেস (সংগঠন), স্বতন্ত্র পার্টি এবং আরও অনেকে। এরপর জনতা পার্টি ১৯৭৭ সালের



লোকসভা নির্বাচনে জিতল এবং মোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী হলেন। বিদেশমন্ত্রী হলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী। কিন্তু এত সুখ বেশিদিন সইল না। কংগ্রেসের দেওয়া টোপ গিলে ফেলে চরণসিং পার্টি ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলেন, তারপর কংগ্রেস তার পেছন থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল। জনতাপার্টির রাজের পতন হল, বিপুল সংখ্যাধিক্যে কংগ্রেস আবার ফিরে এল। ইতিমধ্যে জনতা পার্টির ভিতরের কিছু নেতা ঘোষণা করে দিলেন যে জনতা পার্টির কেউ আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে না। এর উত্তরে পুরনো জনসঙ্ঘীদের নেতা ও মুখপাত্র অটলবিহারী বাজপেয়ী বলেন, জনতা পাটির বাকি শরিকদের সঙ্গে আমাদের মাত্র দুবছরের সম্পর্ক—আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে আমাদের চিরকালের সম্পর্ক। তারপর জনসঙ্ঘীরা বেরিয়ে এসে নতুন দল গঠন করলেন, সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাঁরা পুরনো নাম 'জনসঙ্ঘ' ও পুরনো প্রতীক 'প্রদীপে' ফিরে যাবেন না। নতুন পার্টির নাম হল ভারতীয় জনতা পার্টি, প্রতীক পদ্মফুল, প্রথম সর্বভারতীয় সভাপতি অটলবিহারী বাজপেয়ী। ৬ই এপ্রিল, ১৯৮০ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি প্রতিষ্ঠিত হলো। অর্থাৎ আজকের ভারতীয় জনতা পার্টি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্থাপিত জনসঙ্ঘ দলটিরই ধারাবাহিকতা। সেজন্য জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও জনসঙ্ঘের প্রাণপুরুষ ও তত্ত্ববিদ দীনদয়াল উপাধ্যায়কে ভারতীয় জনতা পার্টির শ্রদ্ধেয় পথপ্রদর্শক বলে মান্য করা হয় ও ভারতীয় জনতা পার্টি-র সব সভা বা প্রচারে এই দুই মহাপুরুষের ছবি থাকে।

## পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি কত হয়েছে

প্রথমেই ভারত সরকারের জনগণনার তথ্য থেকে দেখে নেওয়া যাক মুসলমান জনসংখ্যা কতটা বেড়েছে এবং কিভাবে এই বৃদ্ধি হয়েছে। নীচের সারণীটি দেখুন—

**পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় জনবিন্যাস ১৯৫১-২০১১ (শতাংশ)**

| | ১৯৫১ | ১৯৬১ | ১৯৭১ | ১৯৮১ | ১৯৯১ | ২০০১ | ২০১১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| হিন্দু | ৭৮.৪৫ | ৭৮.৮০ | ৭৮.১১ | ৭৬.৯৬ | ৭৪.৭২ | ৭২.৪৭ | ৭০.৫৪ |
| মুসলমান | ১৯.৮৫ | ২০.০০ | ২০.৪৬ | ২১.৫১ | ২৩.৬১ | ২৫.২৫ | ২৭.০০ |

লক্ষ্য করবেন যে ১৯৫১ সালে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত ছিল

১৯.৮৫%। ১৯৮১ সালে এটা হয়েছে ২১.৫১%। অর্থাৎ ত্রিশ বছরে জনসংখ্যায় অনুপাত বেড়েছে ১.৬৬%। অথচ এই সময়ে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত বাড়বার কথাই না, বরং অনেকটা কমে যাবার কথা। এর কারণ এই ত্রিশ বছরে প্রায় ১ কোটি হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন ফলে জনসংখ্যায় হিন্দুর অনুপাত বেড়ে যাবার কথা। কিন্তু এর উল্টোটাই হল কারণ প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর করা নেহেরু লিয়াকত চুক্তিতে আসকারা পেয়ে, যেসব মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা ফিরে এসে সম্পত্তি ফেরত পেয়ে জাঁকিয়ে বসলেন। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় এলো কমুনিস্টরা। কমুনিস্ট পার্টি দেশভাগের সময় পুরো বাংলাটাকেই পাকিস্তানে দেবার পক্ষে বলেছিল। এবার ক্ষমতায় এসে তারা সেই কাজটাই শুরু করলো। তারা বাংলাদেশি মুসলমানদের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের অবাধ অধিকার দিয়ে দিলো। ফলে ১৯৮১ থেকে ২০১১—এই ত্রিশ বছরে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত বাড়লো তিনগুণ—একেবারে ৫.৫%। মনে রাখতে হবে এই সময়ে বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুরাও পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছেন। এই ভয়ংকর মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গের ভিত্তিটাকেই নষ্ট করে দিল। এর ভয়াবহতা বোঝা যাবে যে ১৯৫১ সালে মালদহ জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৩৮%, সেটা ২০১১ সালে বেড়ে হলো ৫১%। পশ্চিমবঙ্গে এই ধর্মীয় জনসংখ্যার সমস্যা না মেটানো গেলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বই থাকবে না।

### পশ্চিমবঙ্গ মুসলিমপ্রধান হয়ে গেলে সমস্যা কি

পশ্চিমবঙ্গ মুসলিমপ্রধান হয়ে গেলে পশ্চিমবঙ্গ-র ভারতে থাকার আর প্রয়োজন থাকে না। পশ্চিমবঙ্গটাই থাকার প্রয়োজন থাকে না। কারণ আগেই যেটা বলা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয়েছিল যথেষ্ট হিন্দুপ্রধান অঞ্চল নিয়ে, সুতরাং হিন্দু জনসংখ্যার যথেষ্ট প্রাধান্য না থাকলে তার বাংলাদেশ হওয়া ছাড়া গতি নেই। এটা খুব পরিষ্কার হয়ে যাবে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির দিকে তাকালে।



| মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিবেশী | | অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিবেশী | |
|---|---|---|---|
| দেশ | রাষ্ট্রধর্ম | দেশ | রাষ্ট্রধর্ম |
| আফগানিস্তান | ইসলাম | শ্রীলংকা | নেই |
| মালদ্বীপ | ইসলাম | ভারত | নেই |
| পাকিস্তান | ইসলাম | নেপাল | নেই |
| বাংলাদেশ | ইসলাম | ভুটান | নেই |

ভারতকে নিয়ে প্রতিবেশী ৮টি দেশের ৪টি মুসলমানপ্রধান দেশেই রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, সে সব দেশেই ইসলামি ধর্মীয় আইনের কড়াকড়ি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি ২টি হিন্দুপ্রধান ও ২টি বৌদ্ধপ্রধান দেশের সরকারি ব্যবস্থায় ধর্মীয় প্রভাব অনুপস্থিত। মুসলমানপ্রধান ও অপ্রধান দেশের পার্থক্য এখন নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত। ভারতের ভিতরেও আমরা দেখব যে মুসলমানপ্রধান কাশ্মীর উপত্যকা থেকে সব হিন্দুদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ থেকেও হিন্দুদের তাড়িয়ে দিয়ে ২২% হিন্দু জনসংখ্যা কমে ৮% হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এর প্রভাব কি হয়েছে তা আমরা পরে আলোচনা করছি।

এটা গুরুত্ব দিয়ে বলা দরকার যে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার প্রায় ১০% বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারী। এরা ভারতের নাগরিক হতে পারে না। এদের চিহ্নিতকরণ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়ন আমাদের জনসংখ্যার সমস্যা মেটাতে পারে। সুতরাং জনসংখ্যাই আমাদের ভবিষ্যৎ ঠিক করে দেবে। এখনি সজাগ হয়ে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন না করলে শুধু এই জনসংখ্যার ধাক্কাই পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব লুপ্ত করতে আর কয়েক দশক নেবে।

### বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুরা উদ্বাস্তু ও মুসলমানরা অনুপ্রবেশকারী কেন

১৯৫১-এর রাষ্ট্রসংঘের কনভেনশনে যা ১৯৬৭-র প্রোটোকলে সংশোধিত হয় তাতে উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা দেওয়া হয়ছে—'যে ব্যক্তির জাতি, ধর্ম, নাগরিকত্ব বা কোন সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্থার সভ্য হবার জন্য নিপীড়িত হবার যথেষ্ট উপযুক্ত

আশংকা রয়েছে বলে তার নাগরিকত্ব যে দেশের তার বাইরের দেশে রয়েছেন; অথবা এই ভীতির জন্য তার দেশের নিরাপত্তা নিতে আগ্রহী নন; অথবা এই সব কারণে নিজের দেশের বাইরে রয়েছেন এবং ফিরতে পারছেন না বা এই ভীতির জন্য ফিরতে ইচ্ছুক নন।' যেহেতু বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানরা ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত হচ্ছেন ফলে তাঁরা ভারতে চলে এলে রাষ্ট্রসংঘের নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা উদ্বাস্তু বলে গণ্য হতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশী মুসলমানেরা যেহেতু কোনভাবে নিপীড়িত হয়ে আসছেন না ফলে তাঁরা সবাই বেআইনী অনুপ্রবেশকারী। অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য কেউ অন্য দেশে ঢুকতে পারেন না। এজন্য বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৫তে পাসপোর্ট আইন ও বিদেশী আইন সংস্কার করে বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান উদ্বাস্তুদের ভারতে থাকার আইনী অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ১৯শে জুলাই ২০১৬তে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেবার জন্য বিল সংসদে পেশ হয়েছে। সুতরাং এখন পশ্চিমবঙ্গে থাকা সব বাংলাদেশী মুসলমানরা বেআইনী অনুপ্রবেশকারী, এদের বিতাড়ন আমাদের কর্তব্য।

### বামপন্থীরা তো নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে সেটা কি

কমিউনিস্টরা রাশিয়ায় ক্ষমতায় এসে তার সঙ্গের মুসলিমপ্রধান দেশগুলিকেও দখল করে সোভিয়েত ইউনিয়ন তৈরী করে। সেইসব মুসলমানপ্রধান দেশগুলিতে তারা ইসলামি কুসংস্কার বন্ধ করে দেয়, বোরখা পরা বন্ধ করে মেয়েদের বাইরের কাজে নিয়ে এসে সেখানে মৌলবাদীদের রাজত্ব শেষ করে। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য যে এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি জন্মের পর থেকেই ইসলামি মৌলবাদীদের পক্ষে কাজ করে আসছে। ভারতে মুসলমান শাসকরা যারা প্রায় সাত-আটশো বছর বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করেছে, তাদের শোষিত নিপীড়িত বলে কমুনিস্টরা ইসলামি মৌলবাদীদের যে কোন কুকর্মকে সমর্থন করে চলেছে। কমিউনিস্ট সমর্থক বিদগ্ধ ঐতিহাসিক ও সমাজবিদরা ভারতে ইসলামি শাসনে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনাগুলিকে লঘু করে দেখিয়ে বা পুরো চেপে গিয়ে ইসলামি মৌলবাদের শক্তিকে সাহায্য করে গেছে। যেজন্য ছ'শো বছর মুসলমান রাজত্বের ফলে বাংলায় যে কোন প্রাচীন হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দির নেই



সেই সত্যটিও এরা কখনো বলেনি। ১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসে কমরেড জ্যোতি বসুর বামফ্রন্ট সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণে মন দেয়। সারা ভারতে এই প্রথম একজন মাদ্রাসা মন্ত্রী হয়। এরপর হিন্দু সমাজে হাজারো সমাজ সংস্কারের বড় বড় কথা বললেও মুসলমান সমাজকে সেই দেড় হাজার বছরের অন্ধকারেই রেখে দিল মোল্লা-মৌলবীর হাতে। অনুপ্রবেশের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী মুসলমানকে ঢুকিয়ে, তাদের ভোটার করে নির্বাচনে জেতা অভ্যাস করে নিয়েছিল। ২০০৭ সালে তথাকথিত বুদ্ধিজীবি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ইসলামি মৌলবাদ বিরোধী লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বই নিষিদ্ধ করতে উদ্যোগী হন। আদালত তা বাতিল করলে কলকাতার ইসলামি মৌলবাদীদের দিয়ে শহরে হাঙ্গামা করান। এই ছুতোয় তসলিমা নাসরিনকে একবস্ত্রে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহিষ্কৃত করেন। একইভাবে কয়েক বছর আগে বাংলাদেশের ঢাকা থেকে ইসলামি মৌলবাদীদের হাঙ্গামায় তসলিমা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। কমিউনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামি বাংলাদেশের সমপর্যায়ে নামিয়ে আনলো। এরপর ২০১০ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে তিনদিন ধরে উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাতের কাছে দেগঙ্গায় মুসলমানরা হিন্দু ঘরবাড়ি দোকানপাটের উপর আক্রমণ চালিয়ে একতরফা ক্ষতিগ্রস্ত করে। বুদ্ধবাবুর বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ কিছুই করে নি। পরে কেন্দ্রীয় সরকার সৈন্য পাঠিয়ে হাঙ্গামা থামায়। সুতরাং বামপন্থীদের ধর্মনিরপেক্ষতা সবসময়েই ইসলামি মৌলবাদকে সমর্থন করে। এজন্য বামপন্থীদের ভারতে আরেকটি মাত্র ঘাঁটি কেরালায় স্বাধীনতার পরেও দেশভাগের দায়ে কলঙ্কিত মুসলিম লীগ শক্তিশালী হয়ে রয়েছে এবং সেখানে কমুনিস্টরা প্রথম সরকার গঠন করে মুসলিম লীগের সঙ্গে আঁতাত করে।

### বামপন্থীদের পর তৃণমূল এসে কি অবস্থা হলো

তৃণমূল কংগ্রেস ভারতের জাতীয় কংগ্রেস থেকে ভেঙে আসা একটি দল। ফলে তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কংগ্রেসের মতনই। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস কখনোই রাজনৈতিক মতাদর্শ, জাতীয় নীতি এসব নিয়ে মাথা ঘামায় নি। রাজ্যে সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য

ও সেটাই একমাত্র রাজনীতি। এর জন্য সবকিছুতেই রাজী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটাও অনস্বীকার্য এজন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন আপোষহীন লড়াই করেছেন, সেজন্য রাজ্যের মানুষ তাঁর উপর নির্ভর করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে কেন্দ্রে প্রথম এনডিএ সরকারে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হয়েছিলেন। আবার পরে কংগ্রেসের মনমোহন সিংহের সরকারেও যোগ দেন। ২০০৭-এ বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে দু জায়গায় কঠোর সংঘর্ষ হয়। একটি আন্দোলন ছিল মাওবাদীদের পরিচালিত জঙ্গলমহলে, দ্বিতীয়টি হয় নন্দীগ্রামে যার প্রাথমিক নেতৃত্ব দেয় জামাতে উলেমা-ই-হিন্দ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনে জয়ের জন্য মাওবাদীদের সমর্থন করে সাহায্য নেন এবং নির্বাচন জয়ের পর মাওবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর সামরিক ব্যবস্থা নিয়ে তাদের দমন করেন। কিন্তু বামফ্রন্টের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা মুসলিম রাজনৈতিক আকাঙ্খাকে আরো উসকে দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমান তোষণের রাজনীতিকে এক চূড়ান্ত অবস্থায় নিয়ে যান। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে মুসলিম জনসংখ্যার অস্বাভাবিক অতিবৃদ্ধিতে এই সম্প্রদায় দিনে দিনে ভোটের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বামফ্রন্টের নীতির জন্য এই সম্প্রদায়ের মানুষের একটা বড় অংশ এখনো ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাবেই রয়ে গেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ইসলামি মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে হাত মেলালেন। নির্বাচনে জিতেই ঘোষণা করলেন ১০,০০০ মাদ্রাসা স্থাপনের, অন্য সব ধর্মকে বাদ দিয়ে কেবল ইমামদের সরকারি ভাতা ঘোষণা করলেন, প্রায় সব মুসলমানকে বিভিন্ন ওবিসি কোটায় অর্ন্তভুক্ত করে অন্যায্যভাবে অর্থনৈতিক সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে কুরুচিকরভাবে মাথায় কাপড় দিয়ে ঢেকে (যা শিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত মুসলমান মেয়েরা করেন না) উপস্থিত থাকতে শুরু করলেন। ২০০৭-এ তসলিমা নাসরিনকে তাড়িয়ে (যাতে মমতার পূর্ণ সমর্থন ছিল) কমরেড বুদ্ধবাবু জানিয়েছিলেন যে এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সংস্কৃতির অনুমোদন দেবে ইমাম-মোল্লারা, ২০১১ থেকে দলীয় মঞ্চে পীর-ইমামদের হাজির করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে ইসলামি মৌলবাদীরা, দেগঙ্গার দাঙ্গাবাজ থেকে ইসলামি মৌলবাদী সিমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাকে সাংসদ করলেন। এর ফলে যেকোন মুসলিমপ্রধান রাজত্বে যা হয় পশ্চিমবঙ্গে সেরকম আক্রমণ শুরু হয়ে গেল হিন্দু সমাজ সংস্কৃতির উপর।



**পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির উপর কি ধরনের আক্রমণ হয়েছে**

গত দশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ধারাবাহিক আক্রমণ শুরু হয়েছে। সবচেয়ে চিন্তার ব্যাপার যে ইসলামি মৌলবাদীরা এই আক্রমণ চালাচ্ছে শাসক দল ও সরকারের (প্রথম বামফ্রন্ট, পরে তৃণমূল) সম্পূর্ণ সহায়তায়। পশ্চিমবঙ্গের নিয়ন্ত্রণ যে ইসলামি মৌলবাদীদের হাতে তা ২১ নভেম্বর ২০০৭-এ বুঝিয়ে দেওয়া হয় নারীবাদী ইসলামি মৌলবাদ বিরোধী লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা থেকে বিতাড়িত করে। এই কাজটি ইসলামি মৌলবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে করেন কমুনিস্ট বামফ্রন্ট সরকার। এতে বামফ্রন্টকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানায় কংগ্রেস ও তৃণমূল দল। এরপর থেকে ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন ধরণের আক্রমণ ও তার একটি ছোট তালিকা নীচে পেশ করছি। আরো ভয়ংকর ব্যাপার যে বাংলার প্রধান সংবাদপত্রগুলি এইসব ঘটনাগুলি প্রাথমিকভাবে চেপে যাবার চেষ্টা করেছে বা প্রকাশ করেনি। সম্প্রতি সর্বভারতীয় হিন্দি ও ইংরাজী টেলিভিশন চ্যানেলে পশ্চিমবঙ্গের এই খবরগুলি সবিস্তারে প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় বাংলা মাধ্যম খবরগুলিকে বিকৃত করে প্রকাশ করার পন্থা নিয়েছে।

- ***হিন্দু জনপদ আক্রমণ, জ্বালিয়ে দেওয়া, লুটপাট***

পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হলো হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য আর সেই পশ্চিমবঙ্গেই বামফ্রন্টের শেষ সময় থেকেই শুরু হয়ে গেল হিন্দু ঘরবাড়ির উপর আক্রমণ। ঘটনাগুলো পড়লে মনে হবে আমরা বাংলাদেশে আছি।

দেগঙ্গা—৬, ৭, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১০—পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার দেগঙ্গা অঞ্চলে স্থানীয় একটি জমিতে পাঁচিল দেওয়া নিয়ে বিবাদের সূত্রে তিন দিন ধরে দফায় দফায় আক্রমণ চলে হিন্দু বাড়িঘর, দোকানপাট, মন্দিরে। ৮ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকা জানাচ্ছে *'পুড়ল ৬০টি বাড়ি ও দোকান। ... ৩০০টি দোকান ও বাড়িতে চলল ভাঙচুর।'* সেনাও নামান হল। কমুনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পুলিশরা মুসলমান দুষ্কৃতিদের কিছু করবে না ফলে সৈন্য নামাতে হল। ৯ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকার শিরোনাম *'সেনা টহলের মধ্যেই লুঠ দেগঙ্গায়'।* আর এই দাঙ্গার অভিযুক্ত নেতা এক তৃণমূল সাংসদ হাজী নুরুল ইসলাম।

২৪ অক্টোবর ২০১১—কুলপি, দঃ ২৪ পরগণা—স্থানীয় মেলায় ধৃত ৩ জন মুসলমান দুষ্কৃতিকারীকে ছাড়িয়ে নিতে কয়েক হাজার মুসলমান ঝাঁপিয়ে পড়ে কুলপি থানায়। ১৫জন পুলিশ অফিসার সহ অন্যান্যদের বেধড়ক পিটিয়ে ভাঙচুর করে থানাটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। শুধু তাই নয় এর থানা সংলগ্ন পুলিশ আবাসনে হানা দিয়ে হিন্দু মহিলাদের উপর অত্যাচার চালায়।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩—ক্যানিংয়ের নলিয়াখালি অঞ্চলে ৩০০ হিন্দু বাড়ি জ্বালিয়ে দিল মুসলমানরা। এই গ্রামের কাছে একজন ইমামের উপর ডাকাতি হয় ও সে গুলিতে মারা যায়। এই সন্দেহে কলকাতা থেকে গাড়িতে চেপে দুষ্কৃতিকারী মুসলমানরা এসে লুঠতরাজ চালায়। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ও মৌলবাদী সিমি-র সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযুক্ত হাসান ইমরান এই আক্রমণের পরিকল্পনা করে বলে সংবাদে প্রকাশ।

৩রা জানুয়ারি, ২০১৬, কালিয়াচক—পশ্চিমবঙ্গের মালদহে সীমান্ত থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে কালিয়াচকে হজরত মহম্মদের অসম্মানের বিরুদ্ধে জড়ো হয়ে গেলেন লক্ষাধিক মুসলমান। 'অসম্মানের ঘটনা'টি ছিল এক মাস আগে উত্তরপ্রদেশের এক অখ্যাত নেতার একটি বিবৃতি, যার জন্য সেই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠান হয়েছে। তারপর সেখানে পোড়ানো হলো হিন্দুদের দোকানপাট, গ্রাম ও মন্দির। পুলিশ তাদের গাড়ি, থানা পুড়লেও কিছুই করে নি।

১৩ ডিসেম্বর, ২০১৬, ধুলাগড় আক্রমণ---হাওড়া শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে ধুলাগড়। এখানে ১২ ডিসেম্বর নবী দিবসে একটি মিছিল নিয়ে বাজার অঞ্চলে কিছু গণ্ডগোল হয়। এর পরদিন কয়েকশো মুসলমান দুষ্কৃতিকারী বোমা বন্দুক দাহ্য তেল নিয়ে হিন্দু গ্রাম বাজার আক্রমণ করে। পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলে এই আক্রমণ, জ্বালানো হয় শতাধিক বাড়িঘর দোকান, ধ্বংস হয় কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি। কোন পুলিশ কোথাও ছিল না।

৫ই জুলাই, ২০১৭ বাদুড়িয়া আক্রমণ—একটি হিন্দু কিশোর (অপ্রাপ্তবয়স্ক) ইসলামি ধর্মগুরু হজরত মহম্মদের নামে ফেসবুকে অশালীন পোস্ট করেছে বলে খবর ছড়ায়। এই খবর সত্যি হলেও তাতে আদালতে গিয়ে শাস্তির আবেদন করাই আইনী ও সভ্য নিয়ম। তা না করে উত্তর ২৪ পরগণার সীমান্তবর্তী শহর



বাদুড়িয়ায় কয়েক হাজার মুসলমান হিন্দু বাড়িঘরের উপর আক্রমণ চালায়। দুদিন ধরে এই আক্রমণে বয়স্ক বিজেপি কর্মী কার্তিক ঘোষকে রাস্তায় পিটিয়ে হত্যা করে মুসলমান দুষ্কৃতিকারীরা। বিজেপির সর্বভারতীয় সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয় সহ কোন বিরোধী নেতাকে বাদুড়িয়ায় যেতে দেওয়া হয় নি। আধা-সেনা বাহিনী নামিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

- ***হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি***

গত ছয় সাত বছরে বাংলাদেশের মতন এখানে হিন্দু মেয়েদের শ্লীলতহানি ও ধর্ষণ খুব সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাগুরু হলেও সংখ্যালঘু মুসলমান নারীদের ধর্ষণ বিরল ঘটনা। কয়েকটি উদাহরণ—

৮ই এপ্রিল ২০১১—দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার পাতিখালি গ্রামের সবিতা মণ্ডলকে (১৭) ধর্ষণ করে সইফুদ্দিন মিস্ত্রী ও পাপ্পু শেখ। অভিযোগ ধর্ষকদের সাহায্যে দাঁড়ায় তৎকালীন সিপিএম এখন তৃণমূল দাপুটে নেতা সওকত মোল্লা।

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০১২—ট্রেনের মধ্যে কাটোয়া স্টেশনের কাছে এক হিন্দু বিধবাকে ধর্ষণ করে নয়ন শেখ ও ফরিদ শেখ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ শাসক দল ধর্ষকদের আড়াল করতে সক্রিয় হয়।

৭জুন ২০১৩—উত্তর ২৪ পরগণার বারাসতের কাছে কামদুনি গ্রামে ২য় বর্ষের ছাত্রী স্থানীয় ঘোষ পরিবারের মেয়েকে ধর্ষণ করে পরে নির্মমভাবে দুটি পা চিরে ফেলে হত্যা করে পাশের গ্রামের মুসলমান দুষ্কৃতিকারীরা। পরে কামদুনির গ্রামবাসীরা বিচারের দাবিতে সংঘবদ্ধ হলেও তৃণমূল কংগ্রেস ধর্ষণকারীদের আত্মীয়কে নেতা বানিয়ে শান্তি কমিটি তৈরি করে। কামদুনিবাসীরা এখন ধর্ষক সমর্থকদের ভয়েই বাস করছেন।

১১ অক্টোবর ২০১৬—তিন সন্তানের পিতা ইমাম আলি মণ্ডল নদীয়ার হাসখালি থানার গাজনা গ্রামে কিশোরী মৌ রজককে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করে। ব্যর্থ হলে মৌ-কে অ্যাসিড ছুঁড়ে হত্যা করে।

১৬ জানুয়ারী, ২০১৭—দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুরের রসপুঞ্জের মেয়েদের স্কুলের সামনে ছাত্রীদের উত্যক্ত করত কালু মোল্লা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। ১৬ জানুয়ারী মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে ৪ জন হিন্দু ছাত্রীকে সে হত্যা করে।

ইস্কুল কলেজের সামনে মুসলমান যুবকদের অশ্লীলতা বেড়েই চলেছে। ৮ ডিসেম্বর ২০১৬ দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিদ্যানগর কলেজ (এই কলেজে শিক্ষকতা করেছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়) একদল বহিরাগত মুসলমান যুবক কলেজের ছাত্রীদের ছবি তুলতে থাকে, এতে কলেজের হিন্দু ছাত্ররা বাধা দিলে তারা তাদেরকে আক্রমণ করে অনেককে গুরুতরভাবে আহত করে।

পাকিস্তান বা বাংলাদেশে হিন্দুরা মুসলমান মেয়েকে আক্রমণ, শ্লীলতাহানি বা ধর্ষণ করেছে এ ভাবাই যায় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু মেয়েদের উপর মুসলমান পুরুষদের আক্রমণ শ্লীলতাহানির ঘটনা আকছার ঘটে থাকে। এ ব্যাপারে তারা এতটাই আত্মবিশ্বাসী যে ২৪ অক্টোবর ২০১১-তে কুলপির পুলিশ কোয়ার্টারের মহিলাদেরও তারা শ্লীলতাহানি করেছে যা আগেই বলা হয়েছে। ২৮শে এপ্রিল, ২০১৪ সন্দেশখালিতে একটি হিন্দু মেয়েকে তুলে নিয়ে গণধর্ষণ করে ওসমান মোল্লার ডাকাতের দল। ১৩ জুন ২০১৪-তে হুগলির হোসেনাবাদে শেখ নিয়ামত আলি একটি হিন্দু মেয়েকে ধর্ষণ করে। এরকম ঘটনা অনেক আর হিন্দু মেয়েদের বিরক্ত বা শ্লীলতাহানি তো এখন আমাদের সহ্যের মধ্যেই এসে গেছে।

স্মরণে থাকা উচিত বামফ্রন্টের শাসনে খুব পরিচিত দুটি ধর্ষণের মামলা ছিল বানতলা ও ধানতলা। দুটি ক্ষেত্রেই চলে হিন্দু মেয়েদের উপর গণধর্ষণ। বানতলায় মারা যান সরকারি মহিলা অফিসার। এই সবের মূল অভিযুক্তরা ছিল মুসলমান।

- ***<u>হিন্দু ধর্মস্থানে আক্রমণ, পূজায় বাধা</u>***

১২ জুন ২০০৮—গঙ্গাসাগর। স্থানীয় মুসলমান রিক্সাভ্যান চালকদের সঙ্গে বিবাদে ব্যবসায়ী সমিতির ধর্মশালা আক্রমণ করে হিন্দু সংহতির কর্মীদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা চলে। সাগর থানার পুলিশ এসে মধ্যরাতে উদ্ধার করে। পাশের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ভবনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ গঙ্গাসাগর এখন চলে গেছে মুসলমানদের দখলে। সেখানে ইসলামি জলসা চলে। তার তোরণ থাকে অনেকদিন ধরে।

২০১০-এর মার্চ মাসে সাগর দ্বীপের রুদ্রনগরে দুর্গাপূজার মাঠেই মুসলমানরা জোর করে মসজিদ বানানোর চেষ্টা করে। এ নিয়ে পরেও সংঘর্ষ হয়।



৮ জানুয়ারী ২০০৯—মেদিনীপুরে মহরমের শোভাযাত্রায় একটি সংঘর্ষ ঘটে। মেদিনীপুর হিন্দুপ্রধান শহর। কিন্তু মুসলমানদের দাঙ্গার ভয়ে শহরে এর তিন সপ্তাহ পরের সরস্বতী পূজা স্থগিত রাখার ঘোষণা হয়। পূজার দিন কয়েক আগে অনুমতি দেওয়া হয়।

১০ জুলাই ২০০৯—ঝাউবোনা গ্রাম মুর্শিদাবাদ—ঝাউবোনা উচ্চবিদ্যালয়ের সরস্বতী পূজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর সেখানে নমাজ পড়তে চাইলে প্রতিবাদ হয়। এর ফলে হিন্দুদের উপর আক্রমণ শুরু হয়, হিন্দু পরিবারদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হয়। অন্তত: দুজন খুন হন, পুলিশরা আক্রান্ত হয়। পুলিশের গুলিতে ২জন মারা যায়।

১৯মে ২০১৩—হুগলী জেলার বলাগড় থানার দ্বারপাড়া গ্রাম। সেখানে মুসলমানেরা কবরস্থান ঘিরে পাঁচিল তুলতে গিয়ে হিন্দুদের দেবোত্তর জমিও গ্রাস করে। এ নিয়ে সংঘাতে আক্রান্ত হয় হিন্দুরা, ভাঙা হয় লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি।

১০ জুলাই ২০১৩—কলকাতার একেবারে কেন্দ্রে তালতলায় দুর্গা ও কালিপূজার অফিসঘর ভেঙে তার সংলগ্ন মসজিদ সম্প্রসারণ শুরু করে দেয় মুসলমানেরা।

২০১৩-র মে মাসে মালদার কালিয়াচকে শিবপূজার শোভাযাত্রা বন্ধ হয়ে যায় মুসলমানদের বিক্ষোভে।

অক্টোবর ২০১৫—তিন বছর ধরে দুর্গাপূজা করবার অনুমতি চেয়েও বীরভূম জেলার নলহাটি থানার কাংলাপাহাড়ি হিন্দুপ্রধান গ্রামের মানুষেরা। কয়েকঘর মুসলমান পরিবারের আপত্তিতে ও তৃণমূল সরকারের প্রশাসনের সমর্থনে দুর্গা মূর্তি গড়েও তা পূজা করতে পারছেন না গ্রামবাসীরা।

২৬ জুন ২০১৬—মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে ৪০০ বছরের পুরানো রথযাত্রাকে এখন পুলিশের অনুমতি নিতে হয়। পুলিশ প্রথমে অনুমতি দিতে গড়িমসি করে, পরে দিতে বাধ্য হলেও তা পরের দিন ঈদ আছে এই অজুহাতে তার চিরাচরিত পথে রথযাত্রা করতে দেয় না।

দুর্গাপূজায় বাধাদান—২০১৬ ও ২০১৭ সালের দুর্গাপূজার বিসর্জনের চিরাচরিত নীতির উপর হস্তক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মহরমের জন্য দশমীর বিসর্জন সন্ধ্যা

পর্যন্ত ও একাদশীর দিন বিসর্জন বন্ধ করে দেন। ২০১৬-র বিসর্জন ও মহরম নিয়ে মুসলিম দুষ্কৃতিকারীরা খড়্গপুর, নৈহাটিতে হামলা চালায়, এসব জায়গায় কারফিউ ঘোষণা করতে হয়।

৩১ জানুয়ারী, ২০১৭—হাওড়া উলুবেড়িয়ার তেহট্ট হাইস্কুল মাসখানেক ধরে স্থানীয় মুসলমান জনতা বন্ধ করে রেখেছিল, তাদের দাবী সেখানে নবী দিবস পালন করতে হবে। সরস্বতী পূজা ছিল ১ ফেব্রুয়ারি। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সরস্বতী পূজা করতে গেলে তাদের বাধা দেওয়া হয়। ৩১ জানুয়ারী স্কুলে সরস্বতী পূজার দাবীতে ছাত্রছাত্রীরা পথ অবরোধ করলে পুলিশ বেধড়ক লাঠি চালায়, স্কুলের অনেক ছাত্রছাত্রী আহত হয়। একজন ছাত্রী গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকে।

এরকম উদাহরণ অনেক এবং অনেক। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের ধর্ম পালন করতে হবে মুসলমানদের সম্মতি নিয়ে। খাগড়াগড় বিস্ফোরণের চেয়েও তা কম ভয়ানক নয়।

- ***মুসলিম দুষ্কৃতিকারীদের অবাধ সন্ত্রাস ও নির্লিপ্ত প্রশাসন***

দেগঙ্গা, ধুলাগড়, কালিয়াচক—এই তিনটি ইসলামি আক্রমণের সময় রাজ্য পুলিশ উধাও হয়ে যায়। ফলে মুসলমান দুষ্কৃতিকারীরা জানে যে কোন অপরাধ করলেও তাদের পুলিশ কিছু করবে না।

১ ডিসেম্বর ২০১১—দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরা থানার মুসলমান অধ্যুষিত নৈনান গ্রামে পুলিশ যায় বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করতে। পুলিশের উপর শুরু হয় আক্রমণ। পুলিশ গুলি চালালে ২জন মহিলা মারা যান। ব্যস, সব দোষ চাপল পুলিশের ঘাড়ে। ৩জন পুলিশ কর্মী সাসপেন্ড হলেন। বিদ্যুৎ চোরদের জন্য সহানুভূতির ঢল নামল তৃণমূল সরকারের, মৃতাদের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা হল। মুসলমান জনতা বুঝে গেলেন তাদের সব দোষকেই প্রশ্রয় দেবার সরকার এসে গেছে।

২৪ অক্টোবর ২০১১—কুলপি, দঃ ২৪ পরগণা—স্থানীয় মেলায় ধৃত ৩ জন মুসলমান দুষ্কৃতিকারীকে ছাড়িয়ে নিতে কয়েক হাজার মুসলমান ঝাঁপিয়ে পড়ে কুলপি থানায়। ১৫ জন পুলিশ অফিসার সহ অন্যান্যদের বেধড়ক পিটিয়ে ভাঙচুর



করে থানাটিকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে থানা সংলগ্ন পুলিশ আবাসনে হানা দিয়ে হিন্দু মহিলাদের উপর অত্যাচার চালায়।

২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২, রাত সাড়ে নটা। কলকাতা মহানগরের কেন্দ্র মুসলমানপ্রধান রাজাবাজার অঞ্চলে ট্রাম ডিপোর সামনে বাস চাপা পড়ে মারা যান বছর পঞ্চাশের স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আকিল। এর পর শুরু তাণ্ডব। ৪৬টি বাস, ১১টি গাড়ি, ২টি ট্রাম ভাঙচুর হয়। ডিপোয় পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা হয়। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় পরিবহন ডিপোটি। পরদিন ৭টি রুটে বাস বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ কিছুই করে না। এর এক মাস পরে ২৮শে মার্চ আবার রাজাবাজারেই আরেকটি দুর্ঘটনায় জ্বালিয়ে দেওয়া হল ৪টি বাস, ভাঙা হল ৭টি বাস। যে কোন দুর্ঘটনাতে, তা বাসে চাপা বা হাসপাতালে মৃত্যু—যাই হোক না কেন, তাতে কোন মুসলমান যুক্ত থাকলেই, মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে ঘটলেই হিংসাত্মক ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা বেশী। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রশ্রয় চলছে গত প্রায় চার দশক ধরে। রাজাবাজার আর খাগড়াগড়ে কোন পার্থক্য নেই।

২৮ নভেম্বর ২০১৪—জামাতে উলেমা হিন্দের নেতা (এখন মন্ত্রী) সিদ্দিকুল্লার নেতৃত্বে লক্ষাধিক লোক কলকাতার ময়দানে জমায়েত হয়ে সভা করে শহরে বিশৃঙ্খলার ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। মুসলমান জনতার সন্ত্রাসী আক্রমণে তিনজন আইপিএস অফিসার সহ ১১ জন পুলিশ আহত হন, পুলিশের ১১টি গাড়ি ভাঙচুর হয়। পুলিশকে ভয়ে চারদিকে পালাতে দেখা যায়। পুলিশ কোন প্রতিরোধ করে নি।

১৭ জানুয়ারী ২০১৭—কলকাতার পাশেই মুসলিম অধ্যুষিত ভাঙর অঞ্চলে বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য একটি কেন্দ্র (পাওয়ার গ্রিড) বসানোর বিরুদ্ধে সেখানকার মানুষেরা পথ অবরোধ করে, রাস্তা কেটে প্রতিবাদ আন্দোলন করছিলেন। পুলিশ সেখানে গেলে তাদের উপর প্রবল আক্রমণ হয়, ১০টি পুলিশের গাড়ি জ্বালিয়ে বা পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়। আন্দোলনকারীদের বোমা, ইটের আঘাতে অনেক পুলিশকর্মী আহত হন। কিছু পুলিশ তাদের পোষাক খুলে পালান। এত কিছুর পরও পুলিশ কোন লাঠি চার্জ বা গুলি চালায় নি, আন্দোলনকারীরা নিরাপদেই ছিল।

● *পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সংস্কৃতি ও ভবিষ্যতের ভার তুলে দেওয়া হচ্ছে ইসলামি মৌলবাদীদের হাতে*

১ মে, ২০০৫—মেদিনীপুর—তসলিমা নাসরিন কবিতা পাঠ করতে আসবেন মেদিনীপুরে। কিন্তু তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসলামি মৌলবাদীরা। অতএব সংগ্রামী মে দিবসে আগমার্কা কমুনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জেলা প্রশাসন সেই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিল। এই শুরু। এরপর শিলিগুড়ি বইমেলা উদ্বোধন করতে দেওয়া হল না তসলিমা নাসরিনকে।

২১ নভেম্বর ২০০৭—তসলিমা নাসরিনের বিতাড়নের দাবীতে ইসলামি মৌলবাদীরা মধ্য কলকাতার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে সারা দিন ধরে গাড়ি দোকান ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করে। কমুনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পুলিশ বিনা বাধায় তা ঘটতে দেয়। পরদিন এই মৌলবাদীদের দাবী মেনে তসলিমাকে একেবারে একবস্ত্রে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাড়িয়ে দেয় বামপন্থী সরকার।

৬-৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ কলকাতা শহরের কেন্দ্রে উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন পত্রিকা স্টেটম্যানের অফিসকে ঘিরে চলল তিনদিন ধরে লাগাতার মুসলিম তাণ্ডব। স্টেটসম্যান পত্রিকার ৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০৯ সংখ্যায় একজন ব্রিটিশ সাংবাদিকের একটি লেখা পুনঃপ্রকাশিত হয় যাতে সব ধর্মকেই সমালোচনা করা হয়। একটি সংবাদপত্রের উপর এই সরাসরি আক্রমণের বিরুদ্ধে মুখ খোলেননি কোনও রাজনৈতিক নেতা, বিদ্বজ্জন বা মানবাধিকারওয়ালারা। মুসলমানদের তুষ্ট করতে স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদককে পুলিশ গ্রেফতার করে, পরে তিনি জামিনে ছাড়া পান। কোনও সংবাদপত্র এসব খবর ছাপেনি, কোনও টিভি চ্যানেলে তা নিয়ে কিছু বলেনি, কোন সাংবাদিক সংগঠন প্রেস ক্লাবে সভা করেনি, এমনকি এই শহরের বাকী কাগজের সম্পাদকরাও নির্বাক থেকেছেন।

৬মে ২০১১—শুক্রবার। কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম মৌলানা বরকতি কুখ্যাত ইসলামি সন্ত্রাসবাদী ওসামা বিন লাদেনের হত্যার পর তার সম্মানে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করে। এতে অংশগ্রহণ করেন এখন তৃণমূল সাংসদ ইদ্রিস আলি। মৌলানা বরকতি দীর্ঘদিন মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় পাত্র ছিলেন ও তৃণমূলের প্রকাশ্য প্রধান সভায় তিনি মঞ্চে থাকতেন। ইদ্রিস আলি তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় অভিযুক্ত ছিলেন।



৩০ মার্চ ২০১৩—১৪টি মুসলমান সংগঠনের পক্ষে প্রায় পঁচিশ হাজার মুসলমান কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে বাংলাদেশের গণহত্যাকারীদের সমর্থনে সভা করে। পুলিশ এই সভার অনুমতি দেয়।

১৯ ডিসেম্বর ২০১৩ —তসলিমা নাসরিনের লেখা 'দুঃসহবাস' উপন্যাসটি ধারাবাহিক সম্প্রচারের ঘোষণা করেছিল একটি টিভি চ্যানেল। ইসলামি মৌলবাদীরা এক হয়ে তার বিরোধিতায় নামল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের মুসলমান মন্ত্রী ফিরহাদ 'ববি' হাকিম সভায় দাঁড়িয়ে বললেন 'ধর্মদ্রোহী মহিলার এই রাজ্যে কোন স্থান নেই'। পুলিশ এসে চ্যানেলকে বলে দিল সম্প্রচার বন্ধ করতে।

৯ জুন ২০১৪—ভারতের সংসদে রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত আহমেদ হাসান ইমরান পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবে শপথ নিলেন। আহমেদ হাসান ইমরান হচ্ছেন কুখ্যাত ইসলামি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন সিমির প্রতিষ্ঠাতা যা পরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

অক্টোবর ২০১৬ খ্যাতনামা পরিচালক সৃজিৎ মুখোপাধ্যায়ের সেন্সর বোর্ড দ্বারা অনুমোদিত চলচ্চিত্র 'জুলফিকার' কলকাতায় মুক্তি পাবার কথা ছিল। কিন্তু কয়েকটি মুসলিম সংগঠন ছবিটি সম্পর্কে আপত্তি জানায়। ফলে ছবিটি হলে দেখানোর সাহস কেউ পায় না। এরপর এই গোঁড়া মুসলিম সংগঠনগুলির দাবী মেনে কয়েকটি সংশোধন করার পর ছবিটি মুক্তি পায়। পশ্চিমবঙ্গে এখন পুস্তক-নাটক-চলচ্চিত্র কি হবে তা ঠিক করে দেয় মুসলিম মৌলবাদীরা।

**পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবি/বিদ্বজ্জনেরা কেন মেকী ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে থাকেন**

প্রথমতঃ পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবিদের অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে সমাজে ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, কৃষিবিদ—যাঁরা সমাজের অর্থনীতিকে উন্নত করতে সাহায্য করেন তাঁদের মতামতের কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় না। কেবলমাত্র সাহিত্যিক, শিল্পী, গায়ক, অভিনেতা-অভিনেত্রী—এঁদের বুদ্ধিজীবি বলা হয়। এঁদের একটা বড় অংশ বিনোদন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, যাঁরা চিন্তাভাবনায় তেমন পরিশীলিত নন এবং তাঁদের জীবিকার জন্য শাসক দলের

সঙ্গে থাকা ছাড়া উপায় নেই। সমাজবিদ, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক এঁদের প্রধান অংশ পশ্চিমবঙ্গে এবং সারা পৃথিবীতে বামপন্থী প্রভাবের মধ্যে বড় হয়েছেন। বামপন্থীদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা যে এঁরা একটি মতকে প্রতিষ্ঠিত করতেই ইতিহাস সমাজবিদ্যা রচনায় রত থাকেন, সত্যকে প্রয়োজনমত লুকিয়ে রাখেন। এর ফলে কমুনিস্ট দেশগুলিতেও তাদের তখনকার কমুনিস্ট পার্টির নেতার মত অনুযায়ী দেশের ও পার্টির ইতিহাস পাল্টে দেওয়া হয়। ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে এই বুদ্ধিজীবিদের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে ইসলামি অপরাধগুলিকে হয় অস্বীকার করা বা পাণ্ডিত্যের কচকচিতে পাঠককে বিভ্রান্ত করা। এইজন্য বাংলায় মুসলমান শাসনে যে সব হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল তার ইতিহাস এখনো পাওয়া যায় না। বাংলায় আটশো বছর পুরানো মসজিদ পাবেন কিন্তু কোন প্রাচীন বড় মন্দির পাবেন না। এভাবেই একেবারে সাম্প্রতিক পূর্বপাকিস্তানে ও বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার ও বিতাড়ন নিয়ে এখানকার সমাজবিদ, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিকরা একেবারে চুপ থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে মুক্ত চিন্তার চর্চা আরো শুরু হলে আমরা সঠিক বুদ্ধিজীবিদের আমাদের সঙ্গে পাব।

### বিজেপি কি তবে শুধু হিন্দুদের দল, হিন্দুত্বের কথা সেজন্যই বলে

একেবারেই না। বিজেপি সব ধর্মকে সমানভাবেই দেখে। বিজেপি দলের সংবিধানে ধর্ম নিয়ে কোন কথাই নেই। সব ধর্মের মানুষেরাই—হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, পার্শি, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ—বিজেপিতে রয়েছেন। তবে এই বইয়ে মুসলমান বিষয়ে কথা বলা হলো তার কারণ এই বইয়ের মূল বিষয় পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব। যে কথা আগেই বলা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়েছিল বাঙালি হিন্দুদের ও তাঁদের সংস্কৃতির একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে কারণ দীর্ঘ কয়েক'শ বছরের ও সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় বাঙালি হিন্দু মুসলিমপ্রধান একটি রাজ্যে থাকতে চান নি। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত যে একেবারে সঠিক ছিল তার প্রমাণ আজকের বাংলাদেশ যেখানে হিন্দুরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার পথে। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে ইসলামি মৌলবাদের দিনে দিনে দাপট বাড়াতে পশ্চিবঙ্গের অস্তিত্ব সংকটের মুখে। সেজন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গে ইসলামি মৌলবাদের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করলাম। এর অর্থ এই নয় যে বিজেপি দল কোন বিশেষ ধর্মের পক্ষে বা বিপক্ষে।



এবার বলা দরকার যে হিন্দু ধর্ম আর হিন্দুত্ব এক বিষয় নয়। হিন্দু ধর্ম বললেও একক কিছু বোঝানো মুস্কিল। কারণ অন্যান্য প্রায় সব প্রধান ধর্মের মত হিন্দুদের কোন একটি মাত্র পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নেই, একজন মাত্র শীর্ষগুরু নেই, একটিই প্রধান তীর্থস্থান নেই। হিন্দু ধর্মকে হিন্দুদের অনেকেই বলেন সনাতন ধর্ম। এই ধর্মের মধ্যে অনেক ধরণের গোষ্ঠী আছে, অনেক ধরণের পূজ্য দেবদেবী আছেন, অনেক রকমের পূজা পদ্ধতি রয়েছে, অনেক রকমের আহার নীতি আছে। এছাড়া বৌদ্ধ, জৈন, শিখ এদের এই ধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠী বলেও ধরা হয়, হিন্দুরা এদের গুরুদেরও পূজ্য মনে করেন। হিন্দু ধর্ম একটি বটগাছের মতন।

হিন্দুত্ব একটি সাংস্কৃতিক ধারণা। হিন্দু কথাটা স্থানের সঙ্গে জড়িত, সিন্ধু নদীর অপর পারের বাসিন্দাদের পারসিকরা বলতো হিন্দু। এটা সিন্ধু কথাটার রকমফের মাত্র। ফলে সে অর্থে ভারত ভূখণ্ডে যাঁরাই বসবাস করেন তাঁরা সবাই হিন্দু, এখন তাঁদের ধর্ম যাই হোক না কেন। কারণ একসময় এঁদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ধর্মেই বা কোন ভারতীয় ধর্মেই যুক্ত ছিলেন। এর জন্য ভারত ভূখণ্ডের যে কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি—সিন্ধু সভ্যতা থেকে শুরু করে বৈদিক সভ্যতা, উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, বনবাসী মানুষদের সংস্কৃতি ও আজ পর্যন্ত চলে আসা সাংস্কৃতিক পরম্পরা—এই সব মিলেই হিন্দুত্ব যার অপর নাম ভারতীয়ত্ব। একজন ভারতীয় এই পরম্পরার ধারক। এর মধ্যে কোন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নই নেই।

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের সঙ্গে এজন্যই হিন্দুত্ব জড়িত, হিন্দুত্ব বাদ দিলে বাঙালির অস্তিত্বও লুপ্ত হবে। সে হবে বাংলাভাষী, বাঙালি নয়। যে রামায়ণ মহাভারত জানে না, সমগ্র ভারতকে আপন বলে ভাবতে পারে না সে বাংলাভাষী হতে পারে কিন্তু বাঙালি হতে পারে না।

### তাহলে বিজেপি দলের মতবাদ কি

বিজেপি একটি জাতীয়তাবাদী দল যার কাছে দেশের স্বার্থ সবচেয়ে বড়ো অর্থাৎ দলের আগে দেশ। দেশ মানে যেমন ভূখণ্ড তেমনি তার কয়েক হাজার বছরের সভ্যতা সংস্কৃতি। এর পরে বিজেপির দর্শন একাত্ম মানববাদ। বিজেপি দল যে দলের উত্তরসূরী সেই জনসংঘ দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পণ্ডিত

দীনদয়াল উপাধ্যায় (১৯১৬-১৯৬৮) এই দর্শনের প্রবক্তা। পৃথিবীর দুটি প্রধান মতবাদ—ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র—কোনটাই সফল হচ্ছে না কারণ এই দুটি মতই মানুষকে কেবল অর্থনীতির আলোকে দেখে। ধনতন্ত্রে মানুষের দাম কেবলমাত্র অর্থমূল্যে। সমাজতন্ত্রে মানুষের মূল্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মের প্রয়োজনীয়তায়। একাত্ম মানববাদের চোখে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। একাত্ম মানববাদে মানুষের উন্নতি মানে শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি নয়, মানসিক, আত্মিক ও নৈতিক উন্নতিও বটে। একাত্ম মানববাদ ভারতীয় পটভূমিকায় একটি অগ্রণী দর্শন।

এই দর্শনের উপর ভিত্তি করে বিজেপির কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হলো 'পঞ্চনিষ্ঠা' বা পঞ্চ প্রতিশ্রুতি। এগুলি হল---(১) জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় সংহতি (২) গণতন্ত্র, (৩) সর্বধর্ম সমভাব (৪) বিকেন্দ্রীভূত অর্থনীতি (৫) নীতিনিষ্ঠ রাজনীতি।

## পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে বিজেপি কি ভাবছে

এই পুস্তিকায় আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের ব্যাপার নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারলেই অর্থনীতির কথা আসবে। গত ৩৪ বছরে বাম শাসন ও তারপর ৬ বছরের তৃণমূল শাসন পশ্চিমবঙ্গকে আরো দরিদ্র করে তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গ এখন দেশের অন্যতম দরিদ্র রাজ্য। বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য প্রবল। রাজ্যে কোন অর্থ আয়ের সুযোগ নেই ফলে পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার গরীব মানুষ সারা দেশে—দিল্লি, হরিয়ানা, মুম্বাই, কেরল, হায়দ্রবাদ, বেঙ্গালুরুতে কাজ করতে যাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে গরীব পরিবারের মেয়েরা পাচার হচ্ছে সারা দেশে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে স্বল্প আলোচনা নীচে করা হল।

**কৃষি**—পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক কালে কৃষক ও কৃষি জমি নিয়ে খুব মাতামাতি হয়েছে। সিঙ্গুর—নন্দীগ্রামের কৃষিজমি উদ্ধার নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে গেল। কিন্তু কৃষি একটি লাভজনক শিল্প নয়। আমাদের বুদ্ধিজীবি/বিদ্বজ্জনের ছেলেমেয়েরা কেউ কৃষিকাজে আসেন না। একে লাভজনক করতে হলে, কৃষককে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশীদার করতে গেলে কৃষিকে সেচ সার ও উন্নত বীজের মাধ্যমে কয়েকগুণ বেশী উৎপাদনশীল করতে হবে।



আমাদের উন্নত কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। কৃষককে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দিতে হবে যাতে কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার বিভিন্ন কৃষক সহায়ক পদক্ষেপ নিচ্ছে। কৃষিজীবিদের উন্নতিকল্পে কম সুদে ব্যাঙ্ক ঋণ, প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার মাধ্যমে অত্যন্ত কম প্রিমিয়ামে উচ্চ বিমা প্রদান করা হচ্ছে। আগে ফলনের ক্ষতি ৫০ শতাংশ না হলে ফসল বীমায় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ছিল না। এখন সরকার তা কমিয়ে ৩৩ শতাংশ করেছে। এছাড়া নিম মিশ্রিত ইউরিয়া সার প্রচলন করে সারের কালোবাজারি বন্ধ করা হয়েছে।

**শিল্প**—পশ্চিমবঙ্গ দেশের সবচেয়ে জনঘন প্রদেশ। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি এই বিপুল মানুষের কর্মসংস্থান বা ধনোৎপাদন কোনটাই করতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প পরিস্থিতি খুব খারাপ। তৃণমূল সরকার অনেক সম্মেলন করলেও বড় কোন বিনিয়োগ রাজ্যে আসেনি। দেশের অন্যান্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশঃই পিছিয়ে পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গে তাই ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন দরকার, তা বড় শিল্প, মাঝারি সবরকমেরই হবে। দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে শিল্প জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়নবাজীর শিকার হয়ে পড়েছিল। তারপর অধিকাংশ শিল্প রুগ্ন হয়ে পড়লে এতে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে একদল মালিকও কেবলমাত্র স্বল্প সময়ে অনেক মুনাফার জন্য শিল্প আইন ভেঙে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে টাকা না দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকে আরো খারাপ অবস্থায় নিয়ে গেছে। বামফ্রন্ট সরকার শেষ কয়েক বছর শিল্প উন্নয়নে উদ্যোগ নিলেও তা ফলপ্রসূ হবার আগেই বিদায় নিতে হয়। তৃণমূল সরকারের কৃষি-শিল্প কিছু নিয়েই নির্দিষ্ট চিন্তাভাবনা নেই। সিঙ্গুর আন্দোলনে টাটা গোষ্ঠীর বিদায় সারা ভারতের শিল্প জগতে পশ্চিমবঙ্গের একটি খারাপ ভাবমূর্তি তৈরী করেছে। পশ্চিমবঙ্গে জমির সমস্যা শিল্প গড়ার জন্য বাধা সৃষ্টি করেছে। এর জন্য জমির সমস্যাকে উপযুক্ত মূল্য ও সরকারের দীর্ঘমেয়াদী সাহায্যের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। শিল্পাঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত একদল মাফিয়া বিভিন্নভাবে শিল্প মালিকদের কাছ থেকে অন্যায্য তোলা তুলে শিল্পপতিদের নতুন বিনিয়োগ থেকে বিরত করছে।

আধুনিক শিল্প, বিশেষতঃ ম্যানুফেকচারিং শিল্পের প্রতি জোর দিতে হবে।

জনসংখ্যাকে সম্পদ করে তুলবার জন্য আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বিপুল সংখ্যায় বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে যাতে তাদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান হতে পারে।

**শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিষেবা**—একটি উন্নত রাজ্যের জন্য চাই উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সারা দেশে একদা সুনাম ছিল। সেই সুনাম ফিরিয়ে এনে পশ্চিমবঙ্গকে দেশের এডুকেশনাল হাব ও আইটি হাব করতে হবে। এর ফলে শিক্ষিত যুবসমাজের কর্মসংস্থান হবে। এর জন্য প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা পরিচালনায় সুশাসন ফিরিয়ে আনতে হবে। ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থাগুলি যেমন মাদ্রাসা শিক্ষা, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গে থাকার কোন যৌক্তিকতাই নেই। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ অস্তিত্বের কথা মাথায় রেখে ইসলামি বেসরকারী শিক্ষাকেন্দ্রগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। চিকিৎসক ও ঔষধ ব্যবসার স্বচ্ছতার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চিকিৎসার আগে সুস্থ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নির্মাণে গুরুত্ব দিতে হবে।

উপযুক্ত, পরিষেবার জন্য চাই উন্নত পরিকাঠামো অর্থাৎ রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, জলসরবরাহ, হাসপাতাল। এইসব কাজে সরকারের বিরাট ভূমিকা থাকে। বামফ্রন্ট আমলে সরকারি কর্মচারীদের কর্মসংস্কৃতির চূড়ান্ত অবনতির ফলে সরকারি কোন কাজ ঠিকমতন ও সময়মতন হতোই না। শহর মফস্বল গ্রামাঞ্চল সব স্থানেই কোন উন্নতি চোখে পড়তো না। তৃণমূল আমলে কর্মসংস্কৃতির অবনতির জায়গাটি নিয়েছে চূড়ান্ত দুর্নীতি। গত ছয় বছরে স্থানীয় তৃণমূল নেতারা বামফ্রন্টের চৌত্রিশ বছরের সমান টাকাপয়সা করে ফেলেছে। যে কোন জায়গায় বাড়িঘর রাস্তাঘাট কিছু নির্মাণ করতে গেলেই 'সিন্ডিকেট'-এর হাত ধরে করতে হবে। বিজেপি এইসব কিছু মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করতে চায়।

**আপনি কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষায় বিজেপিকে সাহায্য করতে পারেন**

(ক) বিজেপির এই কথাগুলি, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে ইসলামি মৌলবাদের



আক্রমণের বিষয়টি সবার সঙ্গে, পাড়ায়, কাজের জায়গায়, আলোচনা করুন ও তাঁদের সচেতন করুন।

(খ) আপনার পাড়ায় মৌলবাদী বা নতুন লোকেদের আনাগোনা সম্পর্কে সচেতন থাকুন, অন্যদের সচেতন করুন।

(গ) আপনার অঞ্চলে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা বসবাস করছে কিনা সে সম্পর্কে খোঁজ নিন, অন্যদের জানান।

(ঘ) আপনার অঞ্চলে নতুন ধর্মস্থান গড়া হচ্ছে কিনা, তা আইনীভাবে হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে খোঁজ নিন, অন্যদের জানান।

(ঙ) বিজেপির সদস্য হয়ে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাবার কাজে যুক্ত হন। আপনার অঞ্চলে বিজেপির যে কোন কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করে সদস্য হতে পারেন। আপনার সাধ্যমত যতটুকু সময় পারেন ততটুকু বিজেপির জন্য ব্যয় করুন। আপনার অঞ্চলের পার্টি মণ্ডলে আপনি বিভিন্নভাবে পার্টির কাজে সাহায্য করতে পারেন।

(চ) নির্বাচনের সময়ে আপনার বুথের প্রচারে, প্রতিনিধি হয়ে আপনি বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার ও নতুন বাংলা গড়ে তোলার কাজে অংশ নিতে পারেন।

(কৃতজ্ঞতা : প্রশ্নোত্তরে বিজেপি— তথাগত রায়)